যুগান্তর

তারিখ: 08 JAN 2014

শিবিরের রাজনীতি : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাইল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল, তা বর্তমানে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মৌলবাদের ডালপালা বিস্তারকারী এ বিষবৃক্ষকে অস্ত্র দিয়ে কিংবা গায়ের জোরে সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সচেতনতা। নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়াসই রুখতে পারে মৌলবাদী এ সংগঠনটির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। মৌলবাদী চক্রটি বাদে অন্যান্য মত ও পথের সবাই যদি এক পতাকাতলে সমবেত হয়, তবেই এ ক্যাম্পাসকে মৌলবাদমুক্ত করা যেতে পারে। তবে এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের।

একজন নবীন শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার পরই ছাত্রশিবিরের টার্গেটে পরিণত হয়। ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে এই শিক্ষার্থী ক্লাসে প্রবেশের প্রথম দিন পর্যন্ত ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। এটিকে নিছক সম্প্রদান কারকের সাহায্য বলা যায় না। কারণ এর মধ্যে সংগঠনটির স্বার্থ লুকানো থাকে। আর এভাবেই ছাত্রশিবিরের দক্ষ কর্মীরা তাদের পূর্বসূরিদের শেখানো শিক্ষায় সংগঠনটির কর্মী সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি সফল না হয়ে শতকরা দশভাগ সফল হলেও তাদের মিশন 'সাকসেসফুল' হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থাৎ প্রতি সেশনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ছেলে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সেখান থেকে যদি ১০ ভাগ ছেলে ছাত্রশিবিরের সংগঠনের প্রতি জেনে অথবা না জেনে আকৃষ্ট হয়, তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ২৪০ জন। সেই হিসেবে প্রতি বছর তাদের সংগঠনে এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী যুক্ত হচ্ছে। যদি একবার কোনো শিক্ষার্থী ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রথমেই ছাত্রশিবিরের নেতারা যে কাজটি করে থাকে তা হল— ওই শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে। পরবর্তীকালে সংগঠনের আদর্শিক কার্যক্রমের সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল না পেয়ে ওই শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে সংগঠন ছেড়ে দিতে চাইলেও ছাড়তে পারে না। কারণ ছাত্রশিবিরের কাছে তার সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করা আছে। ফলে চাইলে তারা ওই শিক্ষার্থীর ক্ষতি করতে পারে। আর ছাত্রশিবিরের রাজনীতির নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হল, যদি কেউ তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা বেরিয়ে যেতে চায়, তাকে চিরতরে শেষ করে দেয়া। মৌলবাদের চরম এ হিংস্র রূপটি ছাত্রশিবিরের রাজনীতিতে প্রবেশের মুহূর্তে কেউ বুঝতে পারে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি আবাসিক ছাত্র হলের পাঁচটিই এ মুহূর্তে ছাত্রশিবিরের দখলে। ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হলেও ছাত্রশিবির তোয়াক্কা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে 'বৃদ্ধাঙ্গুলি' দেখিয়ে অনুমতি নিয়ে কিংবা অনুমতি ব্যতীত ক্যাম্পাসে নিয়মিত সভা-সমাবেশ করছে। তাদের দখলে থাকা হলগুলোয় গভীর রাতে বসছে মাসিক গোপন বৈঠক। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের পর ক্যাম্পাসে সশস্ত্র শোডাউন করে তারা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক অনলাইনভিত্তিক প্রচারণাও অব্যাহত রয়েছে।

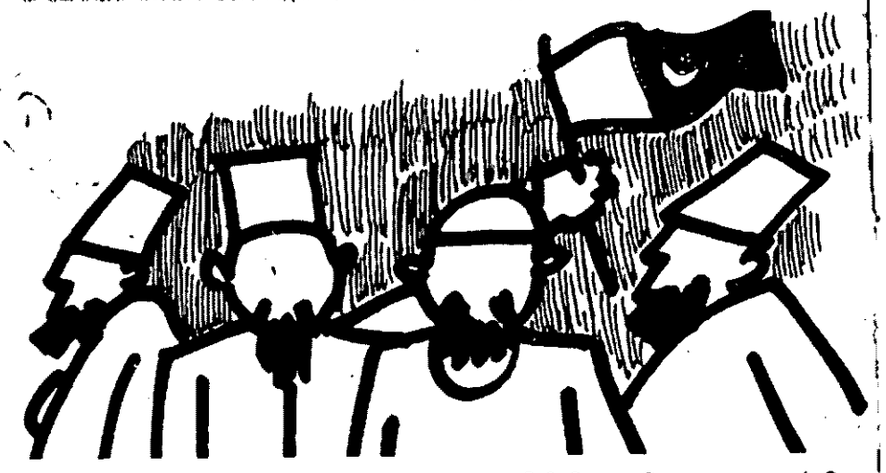

ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের অর্থের প্রধান উৎস হল চাঁদাবাজি। প্রতিটি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক হারে চাঁদা তোলা হয় ছাত্রশিবিরের অফিসিয়াল প্যাডে। এছাড়াও ক্যাম্পাস-সংলগ্ন আশপাশের খাবার হোটেল ও অন্যান্য দোকান থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট হারে অর্থ ছাত্রশিবিরের কোষাগারে জমা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাধ্যমতো ছাত্রশিবিরের কোষাগারে অর্থ জোগান দেয়। প্রতি মাসে অর্জিত এ বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয় পুলিশের হাতে আটক কিংবা গ্রেফতার ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ছাড়ানোর কাজে ও বিভিন্ন প্রণোদনামূলক সাংগঠনিক কার্যক্রমে।

কোরআন ও হাদিস থেকে বিভিন্ন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা প্রদানে ছাত্রশিবিরের কর্মীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। একজন শিক্ষার্থীকে তাদের সংগঠনের প্রতি প্রলুব্ধ করার এ অবস্থাকে বলা হয় 'ব্রেন ওয়াশ'। কোরআনের দ্ব্যর্থবোধক কিছু আয়াতকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে তা সংগঠনের নবীন কর্মীদের মধ্যে প্রচার করা হয়। সবচেয়ে আশংকার বিষয় হল, একজন শিক্ষার্থী তাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরপরই জাতিগত বিদ্বেষ শিক্ষা দেয়া হয়। ইসলামকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিংবা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রতিষ্ঠায় 'জিহাদের' কোনো বিকল্প নেই— এমন ব্যাখ্যা দিয়ে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। 'বাঁচলে শহীদ মরলে গাজী'— এমন মারাত্মক ভুল শিক্ষার ওপর ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আজও চলছে।

উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ এ প্রতিষ্ঠানটিতে পড়তে এসে একজন শিক্ষার্থী সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করছে— এ জন্য ছাত্রশিবিরকে এককভাবে দায়ী বা দোষী করা চলে না। এ জন্য প্রধানত দায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মুহূর্তে একজন শিক্ষার্থী পরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারী থাকে না। অনেক সময় পরিবার দ্বারা তাদের চালিত হতে হয়। অবাক করার মতো বিষয় হল, জেনে কিংবা না জেনে অনেক পরিবার ওই শিক্ষার্থীকে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করে থাকে। অর্থাৎ মৌলবাদের জন্ম হচ্ছে গৃহে! অন্যদিকে অনেক দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা অর্থাভাবে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না, সেই সুযোগ গ্রহণ করে এ মৌলবাদী সংগঠনটি।

কালের পরিক্রমায় জাতির সামনে এসেছে নতুন বছর। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে জামায়াত-শিবির বর্জন করার শিক্ষায় দীক্ষিত করা প্রয়োজন। আর এভাবেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করা সম্ভব।

পলাশ চৌধুরী শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়